কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৭

সূরা সফ (১-৯ আয়াত)

সূরা আস-সাফ কুরআনের ৬১ তম সূরা, এর আয়াত সংখ্যা ১৪ এবং রূকু সংখ্যা ২। সূরা আস-সাফ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। 'সফ' মানে হচ্ছে কাতারবদ্ধ বা সারিবদ্ধতা।

নামকরণ

সূরার চতুর্থ আয়াতের يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا আয়াতাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যাতে 'সফ' শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানা যায় না। কিন্তু এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমান করা যায় যে, সূরাটি সম্ভবত ওহোদ যুদ্ধের সমসাময়িককালে নাযিল হয়ে থাকবে। কারণ এর মধ্যে যেসব পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তা সেই সময়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হলো ঈমানের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে নিষ্ঠা ঐকান্তিকতা অবলম্বন এবং আল্লাহর পথে জীবন কুরবানী করতে উদ্বুদ্ধ করা। এতে দুর্বল ঈমানের মুসলমানদেরও সম্বোধন করা হয়েছে। যারা ঈমানের মিথ্যা দাবি করে ইসলামে প্রবেশ করেছিল তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে আবার যারা ঈমানের ব্যাপারে একনিষ্ঠ ছিল তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন আয়াতে শুধু প্রথম দুটি শ্রেণীকে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন আয়াতে শুধু মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোন কোন আয়াতে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের প্রতি লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে। কোন স্থানে কাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা বক্তব্যের ধরণ থেকেই বুঝা যায়।

শুরুতে সমস্ত ঈমানদারদের এই মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, যারা বলে এক কথা কিন্তু করে অন্য রকম কাজ, তারা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত। আর যারা ন্যায়ের পথে লড়াই করার জন্য মজবুত প্রাচীরের মত দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ তা'আলার নিকট তারা অত্যন্ত প্রিয়।

৫ থেকে ৭ আয়াতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে বনী ইসরাঈল জাতি মূসা (আ) এবং ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে যে আচরণ করেছে তোমাদের রসূল এবং তোমাদের দ্বীনের সাথে তোমাদের আচরণ সেই রকম হওয়া উচিত নয়। হযরত মুসা(আ) আল্লাহর রসূল একথা জানা সত্ত্বেও তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তারা তাঁকে কষ্ট-যন্ত্রণা দিয়েছে এবং হযরত ঈসার (আ) কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশনাবলী দেখতে পাওয়ার পরও তাকে অস্বীকার করা থেকে বিরত হয়নি। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, ঐ জাতির লোকদের মেজাজের ধরন-প্রকৃতিই বাঁকা হয়ে গিয়েছে এবং হিদায়াত লাভের তাওফিক বা শুভবুদ্ধি থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। এটা এমন কোন বাঞ্ছনীয় বা ঈর্ষনীয় অবস্থা নয় যে, অন্য কোন জাতি তা লাভের জন্য উদগ্রীব হবে।

এরপর ৮ ও ৯ আয়াতে চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃস্টান এবং তাদের সাথে ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকরা আল্লাহর এই নূরকে নিভিয়ে দেয়ার যতই চেষ্টা-সাধনা করুক না কেন তা পুরা শানশওকতের সাথে গোটা পৃথিবীতে অবশ্যই বিস্তার লাভ করবে। মুশরিকরা যতই অপছন্দ করুক না কেন আল্লাহর মহান রসূলের আনীত দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা অন্য সব জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্যই বিজয়ী হবে।

অতপর ১০ থেকে ১৩ পর্যন্ত আয়াতে ঈমানদারদের বলা হয়েছে যে, দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলতা লাভের পথ মাত্র একটি। তা হলো খাঁটি ও সরল মনে আল্লাহ তার রসূলের ওপর ঈমান আনো এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এর ফল হিসেবে আখেরাতে পাবে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি, গোনাহসমূহের মাগফিরাত এবং চিরদিনের জন্য জান্নাত। আর দুনিয়াতে পুরষ্কার হিসেবে পাবে আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা এবং বিজয় ও সফলতা।

সূরার শেষে ঈমানদারদের বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর হাওয়ারী বা সাহায্যকারীরা আল্লাহর পথে যেভাবে সহযোগিতা করেছে তারাও যেন অনুরূপভাবে 'আনসারুল্লাহ' বা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়ায় যাতে ইতিপূর্বে ঈমান আনয়নকারি গণ যেভাবে আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করেছিলেন তারাও কাফেরদের বিরুদ্ধে তেমনি সাহায্য সহযোগিতা লাভ করতে পারে।

সূরার ফযীলত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমরা একদা পরস্পর আলোচনা করছিলাম যে, আমাদের মধ্যে কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতো যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন আমল সবচেয়ে প্রিয়? কিন্তু তখনো কেউ দাঁড়ায়নি, ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দূত আমাদের নিকট আসলেন এবং এক এক করে প্রত্যেককে ডেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। আমরা সবাই একত্রিত হলে তিনি এই পূর্ণ সূরাটি আমাদেরকে পাঠ করে শুনালেন।" [এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন] [তিরমিযী হা. ৩৩০৯, সনদ সহীহ]

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ۚ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ

১. আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনি প্রবলপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

'সৃষ্টি জগতের প্রতিটি জিনিস আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করে (অর্থাৎ পবিত্রতা ঘোষণা করে)' এ কথাটি পূর্বে একাধিক সূরায় উল্লেখ হয়েছে, যেমন সূরা নূর (২৪ : ৩৬, ৪১) ও সূরা হাশর (৫৯ : ২৪)। সূরা বনী ইসরাঈল (১৭ : ৪৪)-এ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না। পূর্বে সূরা হাদীদ (৫৭), সূরা হাশর (৫৯) এবং সামনে সূরা জুমুআ (৬২) ও সূরা তাগাবুন (৬৪)-কে আল্লাহ তাআলা এই সত্য বর্ণনার মাধ্যমেই শুরু করেছেন যে, সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।

এটা ভাষণের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। এ ধরনের ভূমিকা দিয়ে বক্তব্য শুরু করার কারণ হলো, পরে যা বলা হবে তা শোনা বা পড়ার আগে মানুষ যাতে একথা ভালভাবে বুঝে নেয়, যে আল্লাহ তা'আলা অভাবহীন এবং অমুখাপেক্ষী।

তাঁর প্রতি কারো ঈমান আনা, সাহায্য করা এবং ত্যাগ ও কুরবানী করার ওপর তাঁর কর্তৃত্ব নির্ভরশীল নয়। তিনি এর অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি যখন ঈমান গ্রহণকারীদের ঈমানের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার শিক্ষা দেন এবং বলেন সত্যকে উন্নতির করা জন্য জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করো তখন এ সব তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই বলেন। তাঁর ইচ্ছা তাঁর নিজের শক্তি ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যেই বাস্তব রূপ লাভ করে। কোন বান্দা তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের সামান্যতম তৎপরতাও যদি না চালায় বরং গোটা পৃথিবী সে পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকরও হয় তবুও তার নিজের শক্তি ও ব্যবস্থাপনা দ্বারা তা বাস্তবরূপ লাভ করে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল?

আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছেন যারা এমন কথা বলে যা নিজেরা করে না এবং ওয়াদা করার পর তা পুরো করে না। পূর্বযুগীয় কোন কোন আলেম এই আয়াতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে বলেন যে, ওয়াদা পূর্ণ করা সাধারণভাবেই ওয়াজিব। যার সাথে ওয়াদা করে সে তা পূর্ণ করার তাগিদ করুক আর নাই করুক। তারা তাদের দলীল হিসেবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এ হাদীসটিও পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মুনাফিকের নিদর্শন হলো তিনটি। (এক) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করবে, (দুই) কথা বললে মিথ্যা বলবে এবং (তিন) তার কাছে আমানত রাখা হলে তা খিয়ানত করবে।" অন্য সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ "চারটি অভ্যাস যার মধ্যে আছে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি অভ্যাস রয়েছে তার মধ্যে নিফাক বা কপটতার একটি অভ্যাস রয়েছে যে পর্যন্ত সে তা পরিত্যাগ করে। এগুলোর মধ্যে একটি অভ্যাস হলো ওয়াদা ভঙ্গ করা। শারহে বুখারীর শুরুতে আমরা এই হাদীসগুলো পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং আল্লাহর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা।

এ জন্যেই এখানেও আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেনঃ তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون)

তোমরা কি লোকদেরকে সৎকার্যে আদেশ করছ এবং নিজেদেরকে ভুলে যাচ্ছ; অথচ তোমরা কিতাব (তাওরাত) পাঠ কর। তবে কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করছ না?" (সূরা বাকারাহ ২: ৪৪)

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : মিরাজের রাতে আমাকে এমন এক জাতির পাশে নিয়ে আসা হল যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। যখনই কাটা শেষ হয় আবার ঠোট পূর্ণ হয়ে যায়। আমি বললাম তারা কারা হে জিবরীল? তিনি বললেন : তারা হলেন আপনার উম্মতের বক্তাগণ যারা বলত কিন্তু তা করত না, তারা কিতাব পড়তো কিন্তু আমল করতো না। (সিলসিলা সহীহাহ ২৯১, আহমাদ হা. ১১৮০১)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : কিছু মু'মিন জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে বলেছিল আমাদের আশা, আল্লাহ তা'আলা যদি প্রিয় আমলের কথা জানাতেন তাহলে আমরা তা আমল করতাম। আল্লাহ তা'আলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম)-কে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর কাছে প্রিয় আমল হল সন্দেহাতীত ঈমান আনা ও কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা ‘আলার পথে জিহাদ করা। যখন জিহাদের বিধান আসলো তখন অনেক মু’মিন তা অপছন্দ করল এবং তাদের ওপর তা কঠিন হয়ে গেল। আল্লাহ তা’আলা তখন এ কথা বললেন। [ইবনে কাসীর]

মোট কথা, কথার বিপরীত কাজ বা কাজের বিপরীত কথা কোনটিই মু’মিনের বৈশিষ্ট্য নয়, যদিও তা খেলাচ্ছলে হয়। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন রবীআহ (রাঃ) বলেন: আমি শিশু থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট আগমন করলেন। তখন আমি খেলা করার জন্য (বাড়ি থেকে) বের হতে লাগলাম। আমার মা আমাকে বলল : হে আব্দুল্লাহ শোন, আমি তোমাকে একটা জিনিস দেব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তুমি তাকে কী দেওয়ার জন্য ডাকছো? তিনি বললেন : খেজুর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তুমি যদি এরূপ না করতে অর্থাৎ খেজুর না দিতে তাহলে তোমার নামে একটি মিথ্যা লেখা হতো। (আবূ দাঊদ হা. ৪৯৯১, সহীহ)

তারপর আল্লাহ তা’আলা মু’মিনদেরকে তাঁর রাস্তায় জিহাদ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন : যারা তাঁর রাস্তায় সীসাঢালা প্রাচীরের মত মজবুত হয়ে সারিবদ্ধভাবে জিহাদ করে তাদেরকে তিনি ভালবাসেন। তাই কাতারবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করা যেমন ফযীলতে পূর্ণ তেমনি যুদ্ধের ময়দানে কাতার থেকে পলায়ন করা বড় ধরণের গুনাহ।

সুতরাং সাবধান! সাধারণ জনগণকে ভাল কথা বলব আর নিজেরা তা করব না-এটা উচিত নয়। এতে দুনিয়াতে যেমন অপমান তেমনি আখিরাতে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। [ফাতহুল মাজীদ]

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

৩. তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে খুবই অসন্তোষজনক।

একথাটির একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে যা এর শব্দসমূহ থেকেই প্রতিভাত হচ্ছে। এছাড়া একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও আছে যা পরবর্তী আয়াতের সাথে এটিকে মিলিয়ে পড়লে বুঝা যায়। প্রথম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, একজন খাঁটি মুসলমানের কথা ও কাজে মিল থাকা উচিত। সে যা বলবে তা করে দেখাবে। আর করার নিয়ত কিংবা সৎ সাহস না থাকলে তা মুখেও আনবে না। এক রকম কথা বলা ও অন্য রকম কাজ করা মানুষের এমন একটি জঘন্য দোষ যা আল্লাহ তা’আলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করার দাবী করে তার পক্ষে এমন নৈতিক দোষ ও বদ স্বভাবে লিপ্ত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। নবী (সা.) ব্যাখ্যা করে বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির মধ্যে এরূপ স্বভাব থাকা প্রমাণ করে যে, সে মু’মিন নয় বরং মুনাফিক। কারণ তার এই স্বভাব মুনাফিকির একটি আলামত। একটি হাদীসে নবী (সা.) বলেছেনঃ “চারটি স্বভাব এমন যা কোন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া গেলে সে হবে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব পাওয়া যাবে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব বিদ্যমান। স্বভাবগুলো হলো, তার কাছে আমানত রাখা হলে সে খিয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করলে নৈতিকতা ও দ্বীনদারীর সীমালঙ্ঘন করে। “(বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ বিষয়ে মোটামুটি একমত যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে যদি কোন ওয়াদা করে (যেমন কোন জিনিসের মানত করল) কিংবা মানুষের সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় অথবা কারো সাথে কোন বিষয়ে ওয়াদা করে আর তা যদি গোনাহের কাজের কোন প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা না হয় তাহলে পালন করে অবশ্য কর্তব্য। তবে যে কাজের প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা করা হয়েছে তা গোনাহর কাজ হলে সে কাজ করবে না ঠিকই কিন্তু তার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কসমের কাফফারা আদায় করতে হবে। সূরা মায়েদার ৮৯ আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। (আহকামুল কুরআন-জাস্সাস ও ইবনে আরাবী)।

এটা হলো এ আয়াতগুলোর সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এরপর থাকে এর সেই বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যে জন্য এক্ষেত্রে আয়াত কয়টি পেশ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতটিকে এর সাথে মিলিয়ে পড়লেই সেই বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জানা যায়। যারা ইসলামের জন্য জীবনপাত করার লম্বা লম্বা ওয়াদা করতো কিন্তু চরম পরীক্ষার সময় আসলে জান নিয়ে পালাতো সেই সব বাক্যবাগীশদের তিরষ্কার করাই এর উদ্দেশ্য। দুর্বল ঈমানের লোকদের এই দুর্বলতার জন্য কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। যেসন সূরা নিসার ৭৭ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ তোমরা সেই সব লোকদের প্রতি কি লক্ষ্য করেছ যাদের বলা হয়েছিল, নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও। এখন যেই তাদেরকে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অমনি তাদের একটি দল মানুষকে এমন ভয় করতে আরম্ভ করেছে যা আল্লাহকে করা উচিত, কিংবা তার চেয়েও অধিক। তারা বলেঃ হে আল্লাহ, আমাদের জন্য লড়াইয়ের নির্দেশ কেন লিপিবদ্ধ করে দিলে? আমাদেরকে আরো কিছুদিনের জন্য অবকাশ দিলে না কেন? সূরা মুহাম্মাদের ২০ আয়াতে বলেছেনঃ যারা ঈমান এনেছে তারা বলেছিল, এমন কোন সূরা কেন নাযিল হচ্ছে না (যার মধ্যে হুকুম থাকবে), কিন্তু যখন একটি সুস্পষ্ট অর্থবোধক সূরা নাযিল করা হলো যাতে যুদ্ধের উল্লেখ ছিল তখন তোমরা দেখলে যাদের মনে রোগ ছিল তারা তোমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কাউকে মৃত্যু আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বিশেষ করে ওহোদ যুদ্ধের সময় এসব দুর্বলতা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। সূরা আলে ইমরানের ১৩ থেকে ১৭ রুকূ পর্যন্ত একাধারে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। [তাফহীমুল কুরআন]

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

৪. নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

এর দ্বারা প্রথমত জানা গেল যে, কেবল সেই ঈমানদারই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হয় যারা তাঁর পথে মরণপণ করে কাজ করতে এবং বিপদ আপদ মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত থাকে। দ্বিতীয়ত, জানা গেল যে, আল্লাহ যে সেনাদলকে পছন্দ করেন তার মধ্যে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক।

এক, তারা বুঝে শুনে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর পথে লড়াই করবে এবং এমন কোন পথে লড়াই করবে না যা ফী সাবীলিল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহর পথের সংজ্ঞায় পড়ে না।

দুই, তারা বিচ্ছিন্নতা ও শৃঙ্খলাহীনতার শিকার হবে না, বরং মজবুত সংগঠন সুসংহত অবস্থায় কাতারবন্দী বা সুশৃঙ্খল হয়ে লড়াই করবে।

তিন, শত্রুর বিরুদ্ধে তার অবস্থা হবে, "সুদৃঢ় দেয়ালের" মত।

এই শেষ গুণটি আবার অর্থের দিক থেকে অত্যন্ত ব্যাপক। যুদ্ধের ময়দানে কোন সেনাবাহিনীই ততক্ষণ পর্যন্ত সুদৃঢ় দেয়ালের মত দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী সৃষ্টি না হবেঃ

- আকীদা-বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য। এ গুণটিই কোন সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিক অফিসারকে পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ করে।
- পরস্পরের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার ওপর আস্থা। প্রকৃতপক্ষে সবাই নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে নিষ্ঠাবান এবং অসদুদ্দেশ্য থেকে মুক্ত না হলে এ গুণ সৃষ্টি হতে পারে না। আর এ গুণটি যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে যুদ্ধের মত কঠিন পরীক্ষা কারো কোন দোষ-ত্রুটি গোপন থাকতে দেয় না। আর আস্থা নষ্ট হয়ে গেলে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য পরস্পরের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে একে অপরকে সন্দেহ করতে শুরু করে।
- নৈতিক চরিত্রের একটি উন্নত মান থাকতে হবে। সেনাবাহিনীর অফিসার এবং সাধারণ সৈনিক যদি সেই মানের নীচে চলে যায় তাহলে তাদের মনে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি হতে পারে না। তারা পারস্পরিক কোন্দল ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ থেকেও রক্ষা পেতে পারে না।
- উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি এমন অনুরাগ ও ভালবাসা এবং তা অর্জনের জন্য এমন দৃঢ় সংকল্প থাকা চাই যা গোটা বাহিনীর মধ্যে জীবনপাত করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে দেবে আর যুদ্ধের ময়দানে তা প্রকৃতই মজবুত দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে থাকবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বের যে শক্তিশালী সামরিক সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল, যার সাথে সংঘর্ষে বড় বড় শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী কোন শক্তি যার মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারেনি এ সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল তার ভিত্তি।

আল্লাহ এই সূরায় সারিবদ্ধ ভাবে লড়াই কারীদের পছন্দ করেন বলে বর্ননা করেছেন। সারিবদ্ধতা শৃঙ্খলার একটি অন্যতম উপাদান। এই সারি বদ্ধভাবে দাড়ানোর বিষয়টা নামাজেও রয়েছে। সুতরাং নামাজ আমাদের সারি বদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করার জন্য তার সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মুমিনদের পথচলার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ হিসাবে পাওয়া যাবে ফাসিক (আয়াত ৫), যালিম (আয়াত ৭), কাফির (আয়াত ৮), মুশরিক (আয়াত ৯) দেরকে। তাদের মোকাবেলায় আমাদের মুসলিমদের একতাবদ্ধ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই।

وَ اِذۡ قَالَ مُوۡسٰی لِقَوۡمِہٖ یٰقَوۡمِ لِمَ تُؤۡذُوۡنَنِیۡ وَ قَدۡ تَّعۡلَمُوۡنَ اَنِّیۡ رَسُوۡلُ اللّٰہِ اِلَیۡکُمۡ ؕ فَلَمَّا زَاغُوۡۤا اَزَاغَ اللّٰہُ قُلُوۡبَہُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ لَا یَہۡدِی الۡقَوۡمَ الۡفٰسِقِیۡنَ ؕ

৫. আর স্মরণ করুন, যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রাসূল অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

যেসব মানুষ ইচ্ছা করে বাঁকা পথে চলতে চায় অথবা তাদেরকে সোজা পথে চালান এবং যারা আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য বদ্ধপরিকর তাদেরকে জোর করে হিদায়াত দান করা আল্লাহর নিয়ম বা রীতি নয়। এর দ্বারা একথা

আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কোন ব্যক্তি বা জাতির গোমরাহীর সূচনা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয় না বরং স্বয়ং সেই ব্যক্তি বা জাতির পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে আল্লাহর নিয়ম বা বিধান হলো, যারা গোমরাহীকে গ্রহণ করে তিনি তাদের জন্য সঠিক পথে চলার উপায়-উপকরণ নয়, বরং গোমরাহীর উপায়-উপকরণেই সরবরাহ করেন যাতে যেসব পথে তারা নিজেদেরকে নিয়ে যেতে চায় সেসব পথে যেন অবাধে যেতে পারে। আল্লাহ তো মানুষকে বাছাই করে নেয়ার স্বাধীনতা (Freeom of choice) দিয়েছেন।

এরপর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিটি মানুষের বা মানুষের দলও গোষ্ঠীর নিজের কাজ যে, তারা তাদের রবের আনুগত্য করবে কি করবে না এবং সঠিক পথ গ্রহণ করবে না বাঁকা পথের কোন একটিতে চলবে। এই বাছাই ও গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন জবরদস্তি নেই। কেউ যদি আনুগত্য ও হিদায়াতের পথ বেছে নেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জোর করে গোমরাহী ও নাফরমানীর পথে ঠেলে দেন না। আর কেউ যদি নাফরমানী করা এবং সঠিক পথ অনুসরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তাহলে তাকে জোর করে আনুগত্য ও হিদায়াতের পথে নিয়ে আসাও আল্লাহর নিয়ম নয়। কিন্তু এটাও একটি বাস্তব ব্যাপার যে, কেউ নিজের জন্য যে পথই বেছে নিক না কেন সে পথে চলার জন্য উপায়-উপকরণ আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ সরবরাহ না করেন এবং অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ পথে কার্যত এক পাও অগ্রসর হতে পারে না। এটাই হলো আল্লাহর দেয়া তাওফীক বা আনুকূল্য যার ওপর মানুষের প্রতিটি চেষ্টা-সাধনা ফলপ্রসূ হওয়া নির্ভর করে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ভাল কাজের তাওফীক আদৌ না চায় বরং উল্টা মন্দ ও পাপ কাজের তাওফীক চায় তাহলে সে তাই লাভ করবে।

আর যখন সে মন্দ ও পাপ কাজের তাওফীক লাভ করে তখন তার মন-মানসিকতার গোটা ছাঁচ এবং চেষ্টা-সাধনা ও কাজকর্মের পথও বাঁকা হয়ে যেতে থাকে। এমন কি ভাল ও কল্যাণকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা ধীরে ধীরে তার মধ্যে থেকে নিঃশেষ হয়ে যায়। "তারা বাঁকা পথ ধরলে আল্লাহও তাদের দিল বাঁকা করে দিল" কথাটির অর্থ এটাই। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি নিজে গোমরাহী কামনা করে গোমরাহীর জন্য তৎপর থাকে এবং গোমরাহীতে নিমজ্জিত থেকে অধিকতর গোমরাহীর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করে তাকে জোর করে হিদায়াতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া আল্লাহর আইন ও নিয়ম-নীতির পরিপন্থী ব্যাপার। কারণ যে পরীক্ষার জন্য মানুষকে দুনিয়ায় বাছাইয়ের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এরূপ কাজ সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্যকেই নস্যাত করে দেবে।

আর এভাবে হিদায়াত লাভ করে মানুষ সঠিক পথে চললেও সেজন্য তার কোন প্রকার বিনিময় বা উত্তম প্রতিদান লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ারও যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। এক্ষেত্রে তো বরং যে ব্যক্তি বাধ্যতামূলক হিদায়াত লাভ করেনি এবং গোমরাহীর মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে তারাও কোন প্রকার শাস্তি লাভ না করা উচিত। কারণ এমতাবস্থায় তার গোমরাহীর মধ্য থেকে যাওয়ার সমস্ত দায়-দায়িত্ব আল্লাহর উপরই বর্তায়। সে বরং আখেরাতে জবাবদিহির সময় এ যুক্তি পেশ করতে পারে যে, আপনার কাছে বাধ্যতামূলকভাবে হিদায়াত দান করার ব্যবস্থা যখন ছিল তখন আপনি আমাকে এই কৃপা থেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন কেন? 'আল্লাহ তা'আলা ফাসেকদের হিদায়াত দান করেন না' বাণীটির তাৎপর্য এটাই। অর্থাৎ যেসব মানুষ নিজেরাই তাদের জন্য গোনাহ ও নাফরমানীর পথ বেছে নিয়েছি তিনি তাদেরকে আনুগত্যের পথে চলার 'তাওফীক' দেন না।

মূসা (আঃ) তাঁর কওমকে বলেনঃ "হে আমার কওম! তোমরা তো আমার রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত রয়েছে, এতদসত্ত্বেও কেন তোমরা আমার রিসালাতকে অস্বীকার করে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ?" এর দ্বারা যেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এক দিক দিয়ে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে। দেখা যায় যে, তাঁকেও যখন মক্কার কাফিররা কষ্ট দেয় তখন তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর রহম করুন, তাকে তো এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এর পরেও তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।" সাথে সাথে মুমিনদেরকে ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন নবী (সঃ)-কে কষ্ট না দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ "হে মুমিনগণ! মূসা (আঃ)-কে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না। তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান।" (৩৩:৬৯)

وَ اِذۡ قَالَ عِیۡسَی ابۡنُ مَرۡیَمَ یٰبَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ اِنِّیۡ رَسُوۡلُ اللّٰہِ اِلَیۡکُمۡ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوۡرٰىۃِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوۡلٍ یَّاۡتِیۡ مِنۡۢ بَعۡدِی اسۡمُہٗۤ اَحۡمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَہُمۡ بِالۡبَیِّنٰتِ قَالُوۡا ہٰذَا سِحۡرٌ مُّبِیۡنٌ

৬. আর স্মরণ করুন, যখন মারইয়াম-পুত্র ঈসা বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা। পরে তিনি যখন সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের কাছে আসলেন তখন তারা বলতে লাগল, এটা তো স্পষ্ট জাদু।

ঈসা (আঃ)-এর ঘটনা এই জন্য বর্ণনা করলেন যে, বানী ইস্রাঈলরা যেমন মূসা (আঃ)-এর অবাধ্যতা করেছিল, অনুরূপ তারা ঈসা (আঃ)-কেও অস্বীকার করেছিল। এতে নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, এই ইয়াহুদীরা কেবল তোমার সাথেই এইরূপ আচরণ করেনি, বরং তাদের সম্পূর্ণ ইতিহাসই নবীদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করাতে ভরপুর। 'তাওরাত'-এর সত্যায়ন বা সমর্থন করার অর্থ হল, আমি যে দাওয়াত দিচ্ছি, সেটা ঐ দাওয়াতই, যা তাওরাতে ছিল। আর এটা প্রমাণ করে যে, যে পয়গম্বর আমার পূর্বে তাওরাত নিয়ে এসেছিলেন এবং আমি ইঞ্জীল নিয়ে এসেছি, আমাদের উভয়েরই মূলসূত্র একটাই। কাজেই যেভাবে তোমরা মুসা, হারূন, দাউদ ও সুলাইমান (আলাইহিমুস্ সালাম) এর উপর ঈমান এনেছ, অনুরূপ আমার উপরেও ঈমান আন। কারণ, আমি তো তাওরাতের সত্যায়ন করছি, তার খন্ডন ও মিথ্যায়ন করছি না।

এখানে ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক সুসংবাদ প্রদত্ত সেই রাসূলের নাম বলা হয়েছে আহমদ। আমাদের প্রিয় শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মুহাম্মদ, আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার কয়েকটি নাম রয়েছে, আমি মুহাম্মাদ, আমি 'আহমদ, আমি মাহী' বা নিশ্চিহ্নকারী; যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ কুফারী নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। আর আমি 'হাশির' বা একত্রিতকারী; আমার কদমের কাছে সমস্ত মানুষ জমা হবে। আর আমি 'আকিব' বা পরিসমাপ্তিকারী । [বুখারী: ৩৫৩২, ৪৮৯৬, মুসলিম: ২৩৫৪, তিরমিযী: ২৮৪০, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৮০, ইবনে হিব্বান: ৬৩১৩] তবে রাসূলের নাম এ কয়টিতে সীমাবদ্ধ নয়। অন্য হাদীসে আরও এসেছে, আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই আমাদেরকে তার নাম উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে কিছু আমরা মুখস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমি 'মুহাম্মাদ' 'আহমাদ, হাশির, মুকাফফি (সর্বশেষে

আগমনকারী), নাবিইউত তাওবাহ (তাওবাহর নবী), নাবীইউল মালহামাহ, (সংগ্রামের নবী)। [মুসলিম: ২৩৫৫, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩৯৫, ৪০৪, ৪০৭]

ঈসা আলাইহিস সালাম এর সুসংবাদ প্রদানের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসেও এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি আমার পিতা (পিতৃপুরুষ) ইবরাহীম এর দোআ, ঈসা এর সুসংবাদ এবং আমার মা যখন আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন তখন তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তার থেকে একটি আলো বের হয়ে সিরিয়ার বুসরা নগরীর প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে গেছে।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৬০০, অনুরূপ বর্ণনা আরও দেখুন: মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৬২] এমনকি এ সুসংবাদের কথা হাবশার বাদশাহ নাজাসীও স্বীকার করেছিলেন। [দেখুন: মুসনাদে আহমাদ: ১/৪৬১-৪৬২]

মূল আয়াতে سحر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে سحر শব্দটি যাদু অর্থে নয়, বরং ধোঁকা ও প্রতারণা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় যাদু অর্থে এ শব্দটির ব্যবহার যেমন পরিচিত তেমনি ধোঁকা ও প্রতারণা অর্থে ব্যবহারও পরিচিতি। যেমনঃ আরবীতে বলা হয় سحره اى حدعه সে অমুক ব্যক্তিকে যাদু করেছে অর্থাৎ ধোঁকা দিয়েছে। যে দৃষ্টি ও চাহনি মন কেড়ে নেয় তাকে বলা হয় عين ساحرة যাদুমীয় চোখ। যে প্রান্তরে চারদিকে কেবল মরীচিকা আর মরীচিকাই চোখে পড়ে তাকে ارض ساحرة যাদুর প্রান্তর বলে। রৌপ্যকে পালিশ করে স্বর্ণের মত উজ্জ্বল করা হলে তাকে বলা হয় سحرت الفضة । সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, যখন সেই নবী, যার আগমনের সুসংবাদ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দিয়েছিলেন স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আস বলেন তখন নবী ইসরাঈল এবং হযরত ঈসার উম্মাতগণ তাঁর নবুওয়াতের দাবীকে খোলাখুলি প্রতারণা ও জালিয়াতি বলে ঘোষণা করল।

وَ مَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنِ افۡتَرٰی عَلَی اللّٰہِ الۡکَذِبَ وَ ہُوَ یُدۡعٰۤی اِلَی الۡاِسۡلَامِ ؕ وَ اللّٰہُ لَا یَہۡدِی الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِیۡنَ

৭. আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে? অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহবান করা হয়। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

আল্লাহর প্রেরিত নবীকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার বলে অভিহিত করা এবং নবীর ওপর আল্লাহর যে বাণী নাযিল হচ্ছে তাকে নবীর নিজের তৈরী কথা বলে ধরে নেয়া

আল্লাহর এই সত্য নবীকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার বলাটাই কোন ছোট খাট জুলুম নয়। কিন্তু সেটা আরো বড় জুলুম হয়ে দাঁড়ায় যখন তিনি আল্লাহর দাসত্ব আনুগত্যের প্রতি আহবান জানান আর জবাবে শ্রোতা তাঁকে গালি দিতে থাকে এবং তাঁর দাওয়াত ও আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য মিথ্যা কলঙ্ক লেপন ও অপবাদ আরোপের কৌশল অবলম্বন করে।

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

৮. তারা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নেভাতে চায়, আর আল্লাহ্, তিনি তাঁর নূর পূর্ণতাদানকারী, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

এ আয়াতটি ৩ হিজরী সনে ওহোদ যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছিল। সে সময় ইসলাম কেবল মদীনা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, মুসলমানদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশী ছিল না এবং গোটা আরবভূমি দ্বীন ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য পুরোপুরি সংকল্পবদ্ধ ছিল। ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার কারণে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুন্ন হয়েছিল এবং আশেপাশের গোত্রসমূহ তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসী হয়ে উঠেছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে বলা হয়েছে, আল্লাহর এই 'নূর' কারো নিভিয়ে দেয়াতে নিভবে না, বরং পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হবে এবং সারা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ক্ষান্ত হবে। এটা একটা স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী, যা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামের ভবিষ্যত কি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সেই সময় আর কে তা জানতো? মানুষ তো তখন দিব্যি দেখছিল, এটা একটা নিভু নিভু প্রদীপ যা নিভিয়ে ফেলার জন্য প্রচণ্ড ঝড়ে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে।

هُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّیْنِ كُلِّهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

৯. তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

মুশরিকদের জন্য অসহনীয় হলেও। অর্থাৎ যারা আল্লাহর দাসত্বের সাথে অন্যদের দাসত্বও করে থাকে এবং আল্লাহর দ্বীনের সাথে অন্য সব দ্বীন ও বিধানকে সংমিশ্রিত করে, শুধু এক আল্লাহর আনুগত্য ও হিদায়াতের ওপর গোটা জীবনব্যবস্থা কায়েম হোক তারা তা চায় না। যারা ইচ্ছামত যে কোন প্রভু ও উপাস্যের দাসত্ব করতে সংকল্পবদ্ধ এবং যে কোন দর্শন ও মতবাদের ওপর নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা এবং তাহযীব তামুদ্দুনের ভিত্তিস্থাপন করতে প্রস্তুত এমনসব লোকের বিরোধিতার মুখেও বলা হচ্ছে যে, তাদের সাথে আপোষ করার জন্য আল্লাহর রসূলকে পাঠানো হয়নি। বরং তাকে পাঠানো হয়েছে এ জন্য যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হিদায়াত ও জীবনব্যবস্থা এনেছেন তাকে গোটা জীবনের সব দিক ও বিভাগের ওপর বিজয়ী করে দেবেন। অবস্থা যাই হোক না কেন, তাঁকে এ কাজ করতেই হবে। কাফের ও মুশরিকরা তা মেনে নিক আর না নিক এবং এ বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়োগ করলেও সর্বাবস্থায় রসূলের এ মিশন সফলকাম হবে এবং পূর্ণতা লাভ করবে। ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের আরো দু'টি স্থানে এ ঘোষণা এসেছে এক, সূরা তাওবার ৩৩ আয়াতে । দুই, সূরা ফাতহের ২৮ আয়াতে । এ স্থানে তৃতীয়বারের মত এ ঘোষণার পুনরুক্তি করা হচ্ছে।

ফুটনোট

⊡ পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী, বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টির উপলব্ধি ক্ষমতা আছে এবং তারা এক আল্লাহর মহীমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করার মাধ্যমে তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার সাক্ষ্য দেয়।

⊡ ঈমান ও দ্বীনদারির মৌখিক দাবি যথেষ্ট নয়। আমলে বা কাজে-কর্মে তার প্রমাণ দিতে হবে।

⊡ যে ব্যক্তি মুখে দ্বীনকে সহযোগিতা করার দাবি করে কিন্তু কার্যত কিছুই করে না, সে যেন একথা না ভাবে যে, তার পক্ষে আল্লাহ তায়ালাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের মানুষ পার্থব জীবন ও পরকালে আল্লাহর কঠিন শাস্তির মুখে পড়বে।

⊡ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা বা চেষ্টা চালানো ছাড়া তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়।

⊡ আল্লাহ যে সেনাদলকে/সংগঠন পছন্দ করেন তার মধ্যে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক।

- তারা বুঝে শুনে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর পথে লড়াই করবে
- তারা বিচ্ছিন্নতা ও শৃঙ্খলাহীনতার শিকার হবে না, বরং সুশৃঙ্খল হয়ে লড়াই করবে।
- শত্রুর বিরুদ্ধে তার অবস্থা হবে, বুনিয়ানুম মারসুস "সুদৃঢ় দেয়ালের" মত।

⊡ অত্যাচারী ও আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করার সময় মুসলমানদেরকে নিজেদের মধ্যকার মাজহাবগত, জাতিগত ও ভাষাগত বিভেদ ভুলে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যেতে হবে।

⊡ পূর্ববর্তী নবীদের পাশাপাশি তাদের জাতিগুলোর ইতিহাসে আমাদের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়। তাদের ইতিহাস জানা গেলে নানা ধরনের সমস্যা ও প্রতিকূলতার মোকাবিলায় বর্তমান সময়ের ঈমানদার মানুষদের ঈমান শক্তিশালী হয়।

⊡ নবী-রাসূলরা কষ্ট পান এমন আচরণ করলে আল্লাহর হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এ ধরনের মানুষ কখনও ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করবে না।

⊡ সকল নবী-রাসূলের পৃথিবীতে আগমনের লক্ষ্য ছিল একটাই। এ কারণে তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। তারা তাঁদের পরবর্তী নবী বা রাসূলের আগমনের সুসংবাদও দিয়েছেন।

⊡ মানবতার প্রতি সবচেয়ে বড় জুলুম হচ্ছে, আল্লাহর বাণী মানুষের কানে পৌঁছে দিতে বাধা প্রদান করা এবং মানব সমাজে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।

⊡ পবিত্র কুরআনের ভাষায় দ্বীনে ইসলাম হচ্ছে নূর বা আলোর সমতুল্য।

⊡ কাফেররা চেষ্টা করবে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দেবে, কিন্তু আল্লাহ তাদের অপছন্দ থাকা সত্ত্বেও তার নূরকে প্রজ্বলিত রাখবেন।

⊡ দ্বীনকে অন্যদের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল।